বিএনপি সরকারের ১০০ দিনের কর্মসূচী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

জামাল উদ্দিন আহমদ

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে আমার আমেরিকায় আসা যাওয়া শুরু। প্রথম দিকে যখন আমেরিকায় আসি, তখন বড্ড একা একা মনে হতো। সেই সময়ে আমেরিকার শহরগুলোতে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোকজন বেশি দেখা যেত না। নিউইয়র্ক এবং লস এঞ্জেলস ছাড়া আর অন্য কোনখানে তখন প্রবাসী বাংলাদেশীদের খুব একটা বসতি ছিল না। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচুর বাংলাদেশী এদেশে এসে আমেরিকান নাগরিক হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। তাই এখন বাংলাদেশী লোকজনদের কমবেশী আমেরিকার প্রায় সবখানেই দেখা যায়।

বিদেশে বাংলাদেশের মানুষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হলো দেশের প্রতি তাদের প্রগাঢ় মমত্ববোধ এবং গভীর ভালবাসা। দেশ থেকে বহুদূরে থাকলেও দেশ ও দেশে ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিতজনদের জন্যে তাদের হৃদয়ের টান খুবই গভীর। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতির খবরে তারা উৎফুল্ল হয়, দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হয়। আবার যখন দেশের অবস্থা খারাপের দিকে যায়, তখন তাদের মন দুঃখে ভারাক্রান্তও হয়ে পরে। বছরের পর বছর বিদেশে বাস করলেও মনে প্রাণে তাঁরা পুরোপুরি বাংলাদেশীই রয়ে গেছেন।

আমার সবেধন নীলমনি দু'টি মেয়ের জন্যে আমাকে প্রায় প্রতিবছরই আমেরিকায় আসতে হয়। যেহেতু আমি নিজস্ব পেশা ছাড়াও রাজনীতি ও এক সময় সরকারের সাথেও যুক্ত ছিলাম, সে জন্যে উত্তর আমেরিকায় আমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকজনের সংখ্যা কম নয়। যখনই আমি এখানে আসি, তখন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। অনেক সময় খবর পেলে তাঁরাও নিজস্ব উদ্যোগে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে দেখা করতে, গল্প করতে আসেন। জানতে চান অনেক কিছু। দেশের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনা প্রবাহের মৌলিক ভাবধারা কোন দিকে গড়াচ্ছে, কেন গড়াচ্ছে, কোন পথে এবং কোন গন্তব্যে দেশের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে, এসব সম্বন্ধে তারা বিস্তারিত জানতে চান। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির কারণে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহের যে বিশাল সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত তথ্য এখন ই-মেইল ও ইন্টারনেটের খবরের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে ঘরে বসে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের কাছে দূরত্ব হার মেনেছে। তাই এখন দেশের কোন ঘটনা প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে আর অজানা থাকে না। এত জানাজানির পরেও তারা অনেকে জানতে চান ঘটনার পেছনে ঘটনা, এমন সব ঘটনা যা সংবাদপত্রে কিংবা অন্য প্রচার মাধ্যমগুলোতেও প্রচারিত হয় না।

এবারে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমার কাছে যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন তার মোটামুটি একটি বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করব। প্রথমত, তারা জানতে চেয়েছেন পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করবে কিনা? জাতীয় মৌলিক প্রশ্নে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সমঝোতার কোন অবকাশ আছে কিনা? এ দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি কোন সমঝোতা না হয়, তাহলে সংসদীয় রাজনৈতিক সরকারের ভবিষ্যত কি?

উত্তরে আমি বলেছি যে এর প্রত্যেকটি প্রশ্নই হচ্ছে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং এ সবের কোন সহজ উত্তর নেই। অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি যে বাংলাদেশের ১৩০ মিলিয়ন জনসাধারণ যেভাবে দেশে সরকার পরিচালনা করা উচিত বলে মনে করে, সেটা আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা বুঝতে চান না। জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে, বিশেষ করে দেশের দু'টি বৃহৎ দলের মধ্যে এখন বিশাল অবিশ্বাসের দেওয়াল গড়ে উঠেছে। জনগণ চায় দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হোক যেখানে সংসদ হবে সরকারের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদে উত্থাপিত হবে দেশের সব সমস্যার কথা এবং এখানেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে এসব সমস্যার সমাধানের উপায়। কিন্তু বর্তমানে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মাঝে সদ্ভাব এবং সদিচ্ছার যে বিরাট অভাব, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তারা দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকার পুরোপুরিভাবে চালু হোক এটা তারা চায় না। তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। তারা যা বলেন তা করেন না আর যা করেন তা বলেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হলো adjustment এবং compromise, যাকে সহজ বাংলায় মিলে মিশে কাজ করা বলা যেতে পারে। কিন্তু এসব উপাদান ও গুণাবলী বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তবে রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দেশে আরও একটা কি দুটো সাধারণ নির্বাচনের পরে বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতার অভাব কমে আসবে বলে ধারণা করেন। এখানে এ ব্যাপারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমটি হলো বাংলাদেশের রাজনীতির ভিত্তি হতে হবে সর্বকালের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। একদলীয় রাজনীতি কিংবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বহির্ভূত কোন শক্তির আবির্ভাবের কোন অবকাশ জনগণ সহ্য করবে না। দ্বিতীয়টি হলো সরকারের পদ্ধতি হতে হবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদীয় সরকার। সংসদীয় সরকারের বিকল্প কোন সরকার বাংলাদেশের মানুষের কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং এ দুটি জাতীয় ম্যান্ডেটকে ভিত্তি করে বর্তমান এবং আগামীদিনে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সরকার পদ্ধতি নির্ধারিত হবে। এর থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে সংসদে যোগদান সম্পর্কে আওয়ামী লীগের পক্ষে বর্তমানে কিছুটা সংশয় থাকলেও তা বেশিদিন জনগণ সহ্য করবে না। জনগণের মতের চাপে তাদের সংসদে আসতে হবে। রাজনীতিতে দলীয়ভিত্তিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ দেশের একটি বৃহৎ জনগণ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সজাগ বলে ধারণা করা উচিত।

নীতিগতভাবে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিশেষ তফাৎ নেই। দুটো দলই প্রায় একই নীতিতে বিশ্বাসী। এ দুটো দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে একটা বিষয় ছাড়া তাদের মতাদর্শ প্রায় একই রকমের। এমনকি ইশতেহারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু'দলের শব্দচয়নও একই প্রকারের। সুতরাং নীতির ক্ষেত্রে দুটো দলের সমঝোতার কোন অভাব এখনো নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না।

আমাকে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তা হলো বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে ১০০ দিনের একটি প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন, সেটার বাস্তবায়ন কতদূর সম্ভব?

একশ’ দিনের প্রোগ্রামে মোটামুটিভাবে সন্ত্রাস, আইনের শাসন, দুর্নীতি, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার পৃথকীকরণ, অর্থনৈতিক সংস্কার, প্রশাসনকে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করা, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এর প্রত্যেকটি বিষয় এতবেশী ব্যাপক এবং জটিল যে এর পুরোপুরি সমাধান ১০০ দিনের মধ্যে কোনভাবেই করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়েছে তা হলো, এ সমস্ত চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে ১০০ দিনের মধ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সন্ত্রাস হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং ভয়াবহ সমস্যা। সমস্ত দেশ জুড়ে এ সমস্যা এমন একটি সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে যে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মহাভাগ্যের ব্যাপার। সন্ত্রাস যদিও সন্ত্রাসীদের দ্বারা সংঘটিত হয়, এর মদদদাতা বা গডফাদারেরা হচ্ছেন বড় মাপের রাজনীতিবিদ, পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ। সন্ত্রাসীরা কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকেন তখন তারা সে দলের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং সে হিসেবে তারা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নিরাপত্তা (protection) পায়।

তাই এই সব সন্ত্রাসীদের সমূলে উৎপাটন করা খুবই কঠিন কাজ। মাঝে মধ্যে এসব সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও তারা বেশিদিন জেলে থাকে না। কারণ পুলিশ বিভাগ তাদের বিচারের জন্যে কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি করে যে আইনের ফাঁক দিয়ে তারা বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিজ দলের একজন সংসদীয় সদস্যের ছেলেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সন্ত্রাসের কারণে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে জেলেও পাঠানো হয়। এছাড়া কয়েকদিন আগে বিএনপি’র একজন শীর্ষস্থানীয় সংসদ সদস্যকে (যিনি ছাত্রদলের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সভাপতি ছিলেন) সন্ত্রাসের কারণে গ্রেফতার করা হয়। এই সংসদ সদস্য এখনো জেলে আছেন বলে প্রকাশ। এসব কিছু উচচ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার জাতির কাছে এটাই প্রমাণ করতে চাচেছন যে সন্ত্রাস দমনের জন্যে সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হবে না। তবে এসব দু’একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সন্ত্রাসকে সমূলে উৎপাটনের জন্যে যথেষ্ট নয়। আরও বেশি ব্যাপক কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত সমন্বিত মানবিক শক্তি রাজনৈতিক সরকারের কাছে কিনা সে সম্পর্কে জনগণের মনে অনেক সন্দেহ বিরাজমান।

দেশে সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রচলন করা একটি সাংবিধানিক কর্তব্য। যে দেশে আইনের শাসনের অভাব আছে, সে দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জানমাল রক্ষার নিশ্চয়তা থাকে না। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে আইনের শাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তবুও অনেক ক্ষেত্রে আইনের অভাব এবং শিথিলতার কারণে সংবিধানে যে আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে সময়ের চাইতে যে বিষয়টি সব চাইতে বেশি প্রয়োজন সেটি হলো সরকারের সদিচছা।

দুর্নীতি সরকারী প্রশাসন এবং জাতীয় জীবনযাত্রাকে প্রায় অচল করে দিয়েছে। দুর্নীতিবিহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা বাংলাদেশে চরম বিলাসিতা। সরকারি প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন ছাড়া দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যে রকম আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন বিদ্যমান, সেটাকে দুর্নীতি বিস্তারের উর্বর প্রজনন ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রকোপ কমানো গেলেও ১০০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি দমন কোনভাবেই সম্ভব নয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন করলেই দুর্নীতির অবসান হবে না।

প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থাকে পৃথকীকরণের জন্যে সরকার ইতিমধ্যে সব পদক্ষেপ প্রায় সম্পন্ন করেছেন। আগামী সংসদীয় অধিবেশনে এজন্যে একটি বিল পেশ করা হবে। এ বিল পাশের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো প্রশাসনের হাত থেকে বিচার ব্যবস্থাকে মুক্ত করা হবে।

শিক্ষাঙ্গন থেকে দলীয় রাজনীতি এবং সন্ত্রাস দূরীকরণ বর্তমান সরকারের চিন্তাধারার একটি বিশেষ অংশ। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিএনপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের কমিটিকে সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামীতে শিক্ষাঙ্গন থেকে পুরোপুরিভাবে দলীয় রাজনীতি দূরীকরণ। এ ব্যবস্থা চালু করতে পারলে সরকার এবং বিএনপি জাতির ব্যাপক প্রশংসা লাভ করবে। তবে এর জন্যে দরকার সদিচছা এবং সাহস। দেশের রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে যে উন্নতমানের শিক্ষাছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। গত ৩০ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এতটা পিছিয়ে গেছি যে সেজন্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ভূমিকা ধরে রাখতে পারছে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই গভীর খাদ থেকে উঠে আসতে না পারলে বিশ্বের কাছে একটা শিক্ষিত জাতি হিসেবে বাংলাদেশের কোন স্বীকৃতি থাকবে না।

এখন অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছু কথা বলে আমার এ প্রতিবেদন শেষ করব। এটা এখন অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন প্রতিকূলতার সম্মুখীন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। মাত্র ১০০ থেকে ১২০ কোটি ডলারের রিজার্ভ দেশের এক মাসের আমদানি এবং বৈদেশিক ঋণ ও সুদের ফেরৎ টাকা যোগান দেবার জন্যে পর্যাপ্ত নয়। আমেরিকা এবং ইউরোপে পোষাক শিল্প রফতানির বাজার আশংকাজনকভাবে কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পোষাক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা যে শুধু দেশের রফতানি শিল্পকে সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করেছে তাই নয়, দেশের অন্যান্য শিল্প, বিশেষ করে কর্মজীবি মানুষের চাকুরির উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে রপ্তানি কমে যাওয়ায় এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত বিদেশী মুদ্রা সাংঘাতিকভাবে কমে যাওয়াতে দেশের আমদানি শিল্পের উপর বিরাট আঘাত এসেছে। এজন্যে বাজেটে দেশের রাজস্ব আয়ের যে টার্গেট করা হয়েছিল তার থেকে প্রায় বিশ ভাগ কম হবে বলে ধারণা করা হচেছ। অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্যে সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে ব্যাংকের সুদ বিশেষ করে রপ্তানি শিল্পের সুদ কমানো হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে কাটছাট করা হয়েছে এবং যে সমস্ত প্রকল্প অর্থনীতিতে সহজ প্রভাব ফেলতে পারবে না সেগুলোকে স্থগিত কিংবা বাদ দেওয়া হচেছ। যে সমস্ত আমদানি পণ্য বিলাস বহুল এবং দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির জন্যে দরকারী নয়, সেগুলোর উপর উচচ আমদানি কর প্রয়োগ করা হয়েছে। এ সমস্ত উদ্যোগ এবং অন্যান্য আরও মুদ্রা ও কর ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে প্রচন্ড অধোগতি অন্ত তঃ কিছুটা হলেও হ্রাস করা সম্ভব হবে ধারণা করা হচেছ। অর্থমন্ত্রী যেভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংস্কারের পদক্ষেপ নিচেছন এবং নেওয়ার কথা ভাবছেন তাতে সফলতা আসবে বলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞের মতামত সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের মত গরীব, সম্পদবিহীন, চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণ এবং সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি নিম্নমানের দেশের পক্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানজনক স্থান লাভ করা একটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতিকে বার বার ধোকা দিয়েছে। তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড এবং দলীয়করণ নীতি দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে। দেশকে বাঁচাতে হলে দেশে সুস্থ এবং জনগণ ভিত্তিক রাজনীতি চালু করতে হবে। সেটা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্ভব কিনা সেটাই হচেছ জাতির জন্যে বড় চ্যালেঞ্জ। ০

লেখক পরিচিতি : জামাল উদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী (বিএনপি সরকারের)। তিনি সম্প্রতি ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন অবস্থানকালে পড়শী’র অনুরোধে এ প্রবন্ধটি তৈরি করেন।

কঠিন সুন্দর সত্য

আমার একুশে, একুশের আমি

বেলাল বেগ

নিউইয়র্কের এক মহিলা ঢাকা থেকে খবর পেয়ে টিভি ছেড়ে টুইনটাওয়ারের ধ্বংসলীলা সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৫২ সনে এ খবরটি নিঃসন্দেহে গাঁজাখুরি হতো। তখনকার ধীরগতির সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির গোলাগুলির খবর তারপরদিন চট্টগ্রামে পোঁছালে স্কুল কলেজে হরতাল হয়ে যায়। তারপর সম্ভবতঃ একমাস শোক পালন করা হয়। এসময় আমরা স্কুলে যাওয়া এবং আসার পথে সুর করে শ্লোগান দিতাম 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দুর সাথে বিরোধ নাই'। আজ যে অমর একুশ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস তাতে যেন আমাদের ঐ কিশোর বয়সের শ্লোগানের ক্ষীনধ্বনিও মিশে আছে। সত্যিই রবীন্দ্রনাথ! 'জীবনের ধন যায়না কিছুই ফেলা'। ভাবতে কি অবাক লাগে, আমাদের ইতিহাসের একটি ঘটনা স্মরণ করবে বিশ্বের সকল দেশ প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে। দেশ, কাল, মানুষ এবং বিশ্বমানবের সভ্যতা কোন বাঙালীর মানসলোকে মূহূর্তে বাঙময় হয়ে উঠলে তিনিই কেবল আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে বাঙালী হিসাবে রোমাঞ্চিত হবার ক্ষমতা রাখেন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই।

যে একুশকে বিশ্ববাসী এবং বিশ্বসভ্যতা মর্যাদা দিল সে একুশের তাৎপর্য আমাদের জীবনে আমরা প্রায় অর্থহীন করে দিয়েছি। একুশের চেতনা আমাদের জীবনে ক্রিয়াশীল থাকলে বাংলাদেশে কখনই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং একাত্তরের কসাইগণ ক্ষমতায় আসতে পারতনা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতাও শহুরে লুটেরা শ্রেণীর কুক্ষিগত হতনা। তবে তাই বলে আমরা উৎসবে কোন কার্পণ্য করেছি তা বলা যাবেনা। বরং বলা যায় একুশকে ঘিরে আমাদের উচ্ছ্বাস এবং উৎসবের কোন তুলনা নেই।

আমরা ঢাকায় যেখানে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শহীদ হয়েছিলেন সেখানে শহীদ মিনার বানিয়েছি। আমরা লাখো লাখো বাঙালী দিনভর সেখানে সারি বেঁধে খালি পায়ে হেঁটে গিয়ে, ' আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানে বাতাস বেদনাবিধুর করি এবং ফুলে ফুলে সমুদ্র রচনা করি। এমন একটি পূতপবিত্র উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে মনে হয়না। এমন একটি দিনকে ঘিরে সাহিত্য সৃষ্টির যে উন্মাদনা তাও পৃথিবীর খুব কম দেশে দেখা যায়।

খালি পায়ে মন্দিরে মসজিদে ঢোকা, আখড়ায় মাজারে পীর-সাধুর সামনে যাওয়া বাংগালির বহু প্রাচীন রীতি। শহীদ মিনারে তা প্রবর্তিত হয়েছিল বলে বিষয়টি বাঙালীর মনে ধরেছিল। তাই শহরে-বন্দরে, গ্রামেগঞ্জে স্কুল কলেজ ক্লাব প্রাঙ্গনে লাখে লাখে শহীদ মিনার গড়ে উঠল। গত তিন দশকে বাঙালীরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যেখানেই গেছে সেখানে প্রতিমার মত মিনার বানিয়ে তাতে ফুল চড়িয়ে একুশের গান গেয়ে থাকে। নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘ ভবন এলাকায় ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে বাঙালীদের যে দাপাদাপি হয় তা দেখে আমেরিকান সাংবাদিকরা অবাক হয়ে ভাববেন ব্যাপারটা কি ? এ মানুষগুলি এমন বালখিল্য আচরণ করে কেন ?

বিদেশীরা বুঝবেনা। কিন্তু আমরা জানি এরই নাম হুজুগ এবং এ হুজুগ ছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীন। হুজুগের কোন যুক্তি নেই কিন্তু শক্তি আছে। হুজুগ মননের নয়, আবেগের ব্যাপার। শহীদ দিবস বাঙালীর অন্তরের ধন। এটা হলো কিভাবে ?

কারণ অনেক। পাঞ্জাবী, সিন্ধি, মারাঠি, নেপালি, ভুটিয়ার মত বংগও একটি জাতি ছিল। মধ্যযুগে আরব, মোঘল এবং পাঠানদের আক্রমণ ও দখলকালে তাদের ধর্ম ইসলাম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।একশ্রেণীর মধ্যযুগীয় শাসক ইসলামকে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে প্রয়োগ শুরু করলে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক জাতিস্বত্তাগুলির সংগে তার মরনপণ দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এরই প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় জাতিস্বত্ত্বাগুলি হিন্দু ও শিখ ধর্মের ঝান্ডা তুলে ধরতে থাকে। ১৭৫৭ সালে সামান্য সংখ্যক ইংরেজ বণিক বংগদেশ দখল করে। সে সময় ইউরোপে মধ্যযুগশেষে জাতিরাষ্ট্রগুলি নব নব জ্ঞান ও ধ্যানধারনায় জেগে উঠছিল। জাতি হিসাবে সচেতন হয়েই ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দজ, পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে এসেছিল। ফলে ভারতবর্ষের বাস্তবতা তারা খুব সহজে বুঝে ফেলে এবং বিশাল ভারতবর্ষে অনৈক্য ও বিভক্তি বজায় রেখে ভারতবাসীকে পদানত রাখার মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে তারা ধর্মকে ব্যবহার শুরু করে। তাদের এ জঘন্য কূটনীতির প্রথম প্রয়োগ সিরাজদ্দৌলার ধ্বংস দিয়ে শুরু হয়। ইংরেজরা মুসলমান শাসকদের উচ্ছেদ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে টেনে নিয়ে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি শক্ত করেছিল। তাদের এ ষড়যন্ত্র কৃতকার্য হয়। এভাবে সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকিয়ে আজন্ম অসম্প্রদায়িক, উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী বাঙালীকে তার জাতিস্বত্তা নিয়ে দাঁড়াতে দেয়নি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বৃটিশের শাসন শহরকেন্দ্রিক থাকায় সাম্প্রদায়িকতাও শহরকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। তখন যেমন আজও তেমন প্রকৃত বাঙালী জাতি পড়ে আছে অপূর্ব সুন্দর নামের শত শত নদী ঘিরে হাজার হাজার গ্রামগঞ্জে। বাঙালী কাব্য ও সংগীতপ্রিয় একটি জাতি। নিরীহ ও শান্ত স্বভাবের কারণে তাদের ভেতো বাঙালীও বলা হত। ১৯৫২ সনে ঢাকায় গুলি করে বাঙালী মারার খবর সারা দেশের মানুষকে বিচলিত করে দিয়েছিল। ঠিক সে সময় সুরে সুরে ছড়িয়ে গেল 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'। প্রচার করা হল বাঙালীকে বাংলা বলতে দেয়া হবেনা কারণ তা হিন্দুদের ভাষা। ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরিবাকুরি সবকিছু উর্দুতে হবে। ব্যস, ক্ষ্যাপে গেল বাঙালী। বাঙালী যে একটি জাতি এবং বাংলা যে তাদের ভাষা এ যেন রাতারাতি প্রকাশ হয়ে গেল। একই সময়ে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লিখিত এবং শহীদ আলতাফ হোসেন সুরারোপিত একুশের অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তরঞ্জিত একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' বাঙালীর মনে এমন একটি বেদনাময় ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে যে ধর্ম গোত্র উচ্চনীচ ধনীনির্ধন ভেদাভেদ ভুলে তারা জাতীয় স্বার্থে এক হয়ে যায়। মাত্র পাঁচবছর আগে যে মুসলিম লীগের ধর্মীয় উসকানিতে বাঙালীরা পাকিস্তান সৃষ্টিতে জানবাজি রেখেছিল, এর মাত্র দুবছর পরে ১৯৫৪ সনে সে মুসলিম লীগের অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। যুক্তফ্রন্টে সমবেত রাজনৈতিক দলগুলি বাঙালী জাতির প্রথম ম্যাগনাকার্টা ২১শ দফা রচনা করে। সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। বাঙালী জাতি হিসাবে তার পূর্ণ সম্বিত ফিরে পায়। জাতির জনক বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এ জাতিস্বত্তাকে আরও দুর্বার করেছিলেন বলেই বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি দেবার মানসিক শক্তি পেয়েছিল।

'৫২ থেকে ছুটে '৭১য়ে এসে আতসবাজির মতই যেন বাঙালীর শক্তি ফুরিয়ে গেল। '৫৪র পরাজিত শক্তি '৭১য়ে দাফন হওয়ায় বাঙালীরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেন 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে'। এরই সুযোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুগণ '৫৪ এবং '৭১এর পরাজিত শত্রুদের আবার সংঘবদ্ধ করে। বংগবন্ধুকে হত্যা করে তারা বাঙালীর ইতিহাস বদলে দিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তারই সর্বশেষ প্রক্রিয়ায় তারা ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনছে। কি জানি বাংলা আবার হিন্দু ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত হয় কিনা; তাকে ইসলামি করনে আবার কোন উন্নয়ন বোর্ড বসে কিনা! জাতি হিসাবে বাঙালীর এ অধঃপতন হলো কেন? উত্তর সহজ। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অযোগ্যতা এবং অক্ষমতা। রাজনীতি জনগণের ক্ষমতা হরন করে সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং তাদের সহযোগী লুটেরা ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলে দেয় এবং জনগণ ঐ লুটেরা জোটের সেবাদাসে পরিণত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিও মানুষের মাঝে তাদের ত্যাগের মহত্ব, বিজয়ের গৌরব এবং মনুষ্যত্বের অহংকার আলোহাওয়ার মত ছড়িয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু বাগাড়ম্বের কোন কমতি ছিলনা। বংগবন্ধু হত্যাকান্ড পরবর্তী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ে একুশকে এক একটি নতুন শপথে অভিহিত করে মানুষ অনুপ্রেরণা খুঁজত। শেষ পর্যন্ত একুশের একটি চিরজীবী অর্থ ঠিক করা হলো : 'একুশ মানে মাথা নত না করা।'

২০০২ সনে উন্নত বা নত করার মত মাথাই আমাদের স্কন্ধে অবশিষ্ট নেই। কারণ তিনবার যারা শহীদ মিনার ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং একবার '৭১সনে ২৫শে মার্চে শহীদ মিনার উপড়ে দিয়ে তাতে আযান দিয়েছিল, তারাই এখন বাংলাদেশের শাসক হয়ে বসেছে। এখন একুশ যদি মাথা নত না করা হয়, তার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের সামনে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের ডাক এসেছে। আমাদের এবারের শত্রু মরা পাকিস্তানের ভূত এবং বাঙালী লুটেরা রাজনীতিক।

পাকিস্তানী ভূতের আখড়া মাদ্রাসা এবং নিবাস মাদ্রসাশিক্ষিত মওলানা-মৌলভী ও মওদুদী ইসলামে বিশ্বাসী সামরিক-বেসামরিক মানুষদের মনমগজ। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তক ইংরেজ প্রভুদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের আফিম খাইয়ে মুসলমানদের নেশাগ্রস্ত ও পশ্চাদপদ রাখা। বৃটিশের উদ্দেশ্য এতটাই সফল হল যে দেশ স্বাধীন হবার পরেও ঐ অপ্রয়োজনীয় মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা মোলা-মৌলভীরা প্রাণপনে আঁকড়ে ধরে রাখে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা ইসলাম ধর্মে অনাকাঙ্খিত যাজকশ্রেনীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। মাদ্রাসায় মাস্টারি এবং মসজিদে ইমামতি ছাড়া মাদ্রাসা পাশ যুবকদের আর কোন কর্মের সুযোগ নেই। ফলে এরা স্বনিয়োজিত ধর্মপ্রচারক হয়ে একটা পরজীবী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ধর্মকে হাতিয়ার বানিয়ে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়,তাদের শক্তির উৎস এই পশ্চাদপদ ধর্মান্ধ যুবকশ্রেণী। ইদানীং এসব মাদ্রাসা ছাত্র বা তালেব আলেমদের সামনে ইরান আফগানিস্তান স্টাইলে ইসলামি বিপবের আদর্শ তুলে ধরেছে জামাতে ইসলামি। ফলে মাদ্রাসাশিক্ষিত বেশ বড় একটা শ্রেণী ইসলামি শিবিরের ক্যাডার বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এদের ঘাঁড়ে পা দিয়ে ক্ষমতায় গেছে একাত্তরের খুনিরা। পাকিস্তানের এসব ভুতেরা এখন আর অদৃশ্য থাকার প্রয়োজন বোধ করেনা। ফলে এদের ধরিয়ে দেবার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবেনা।

যে কোন যুদ্ধের জন্য একটা ঘোষণা দিতে হয়। আগামি একুশে ফেব্রুয়ারি একুশ এবং '৭১র রক্তবিধৌত বাঙালী জাতীয়তাবাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ 'ভদ্রবেশী লুটেরা অসৎ রাজনীতিক'দের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়। এজন্য মিনার চত্বরে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনতার সংগে আরও একটি দেয়াল লিখন প্রকাশ করা যায় যার রচনা হবে:

বিশেষ সতর্কবাণী

যে সমস্ত ভ্রষ্ট রাজনীতিক ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসের জন্য কুখ্যাত হয়েছেন,
ঘন ঘন দল বদল করে রাজনীতিকে লুটেরাদের খেলা বানিয়েছেন,
দেশ ও জাতির মুখে চুনকালি মাখিয়েছেন,
এবং যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা পদ, ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার লোভে
বাঙালীর সর্বকালের অহংকার মুক্তিযুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করছেন ,
তারা কেউ শহীদ মিনারের এ পবিত্র সিঁড়িগুলিতে পা রাখবেন না।
এ নির্দেশ অমান্য করলে শহীদদের আত্মার শান্তি বিনষ্ট হবে।
আমরা তা হতে দেবনা। ০

নিউ ইয়র্ক
জানুয়ারী ২০, ২০০২।

বিষয়-বিষয়ান্তরে

এনরন-এর হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি

দেওয়ান শামসুল আরেফিন

এ জগতে হায় সেই বেশী চায়
আছে যার ভুরি, ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত
কাঙ্গালের ধন চুরি।'

দেউলিয়া ঘোষিত এনার্জী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এনরন-এর ক্ষেত্রে যথার্থ প্রযোজ্য এক কবিতা-মন্তব্য বল্লে কি খুব একটা বেশী অত্যুক্তি করা হবে ? জনৈক কলামিষ্ট জন জে. ফার্মার ইতিমধ্যেই এনরনের বিপর্যয়কে Crook Capitalism এর প্রকাশ বলে অভিহিত করেন। মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী Reductionist বুদ্ধিজীবীরা এমনিতেই দাবী করেন Property is theft (সম্পদের অপর নাম চৌর্যবৃত্তি)। স্বভাবতই, তাদের সম্প্রসারিত চিন্তামতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজ অনুমোদিত, নিয়মাবদ্ধ, আইনানুগ চৌর্যবৃত্তির অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং পুঁজিবাদ মূলতঃ ব্যক্তিগত সম্পদের অর্জন ও নিশ্চতকরণের উপর নির্ভরশীল। গেলো বছর আমেরিকার ৭ম বৃহত্তম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত এনরনের বিপর্যয় এক ধরনের আদর্শিক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে সমাজের বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে বিত্তশালী শ্রেনী এবং সংরক্ষণশীল আদর্শের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক গত ১৭ জানুয়ারি সম্পাদকীয়তে লিখেছে সমাজতন্ত্র কাজ করে না কারণ সমাজতন্ত্র মানুষের স্বভাব প্রকৃতি বিরুদ্ধ একটি ব্যবস্থা। অসম প্রচষ্টা ও পরিশ্রমের সম-পরিমাণ পুরস্কার গ্রহণে মানুষ অপরাগ। সমাজতন্ত্রের আরোপিত এই অবিচার ও অন্যায়কে মানুষ বরদাশত করতে চায়না। সম্পাদকীয়টি আরো বলে এটা যেমন সত্য,

তেমনি সত্য এটাও যে মানুষ সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পদ্ধতিতে স্বস্তি পায় না। সম্পাদকীয়টি আরো লেখে ঃ যখন অনেক টাকা পয়সার লেন-দেন হয় এবং সেখানে সেটা দেখার কেউ থাকে না, সেক্ষেত্রে There is usually somebody perfectly willing to steal it. That is human nature too.

সাধারণ মানুষের আর্থিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে পুঁজিবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও যথাযর্থতা নিয়ে তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগিক আলোচনা-সমালোচনা বহুকালের। বিশ্বায়নের ব্যাপারটি আলোচনা-সমালোচনার পরিধি বিস্তৃততর করেছে। অতি সম্প্রতি মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আর্জেন্টিনার ৫ম প্রেসিডেন্ট ডিলহার্দে তার দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য 'মুক্ত বাজার' নির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে দায়ী করেন। এই সংকট সৃষ্টির পেছনে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইত্যাদি সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। তার পর্যবেক্ষণ যে অমূলক নয় তা স্পষ্ট হয় আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হর্ষ্ট কোহলারের (Horst kohl's) সাম্প্রতিক এক পদক্ষেপে। কোহলার ২৪ সদস্যের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের এক সভায় আর্জেন্টিনার এবছর দেয় ৯৯৩ মিলিয়ন ডলারের ঋন এক বছর পিছিয়ে দেন। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের আইরন কার্টেনের যবানিকাপতের এক যুগ পরে পুঁজিবাদের সোনালী প্রত্যাশা সেই সময়ের থেকে গভীরতার দৈন্যের যবনিকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাশিয়ার নব্য অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বলিত পরিকল্পনাটির প্রধান ছিলেন হার্ভার্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লবেন্স সামারস (ক্লিন্টন মন্ত্রী পরিষদের সাবেক ট্রেজারী সেক্রেটারী)। ডব্লিউটিও এর বিভিন্ন সমাবেশে ব্যাপক প্রতিবাদ, মিছিল ইত্যাদিও পুঁজিবাদ ও তার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের নেতিবাচক মনোভাবটিকে প্রকাশ করে বলে অনেকে মনে করেন।

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উপযোগিতা এবং আধিপত্যবাদ নিয়ে যখন সংশয়ের ঝড় বইছে ঠিক সেই সময়ে এধরনের ঘটনা সাধারণ কর্মী ও বিনিয়োগকারীদের কাছে অনেকটা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আভির্ভূত হয়। এনরনের কর্মকর্তা শ্যারন ওয়াটকীনস (Sherron Watkins) এর মেমো অনুযায়ী ব্যাপারটি মোটেই আকস্মিক ছিলো না। মেমোতে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তার আশংকার কথা জানিয়ে লিখেছিলেন - We will implode in a wave of accounting scandals .. Not ever Anderson's approving audits will protect Enron if these transactions are ever disclosed in the bright light of a day. উল্লেখ্য, শেরন এর আগে এধরনের এ্যাকাউন্টিং ফার্ম আর্থার এ্যান্ডারসেন এলএলপি'র কর্মকর্তা ছিলেন। প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে পুরো ব্যাপারটিই Incestous সম্পর্কের উপর চলছিল বলে কলামিষ্ট জন জে. ফার্মার মন্তব্য করেন। এ্যাকাউন্টিং ফার্ম কনসালটিং ফার্মেরও কাজ করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। Conflict of interest এর তোয়াক্কা তারা করেননি। যে কারণে, প্রয়োজনীয় বহু কাগজ ধ্বংস করে দিতে তাদের বিবেকে বাধেনি। এই অস্বাভাবিক যোগসাজসের কারণে কৃত্রিম লাভ দেখানো, লোকসান লুকানোর কাজে তারা ইতস্তত করেনি। জানা যায়, এই অর্থলিপ্সু চক্র এধরনের ৮৮১টি বৈদেশিক শাখা খুলে যার মধ্যে ৭০০টিই ছিল কেমেন আইল্যান্ডে (Cayman islands)। উচ্চাসীন কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তাদের ষ্টক অপশন বিক্রীর সুযোগ অবগত করা হয় - সাধারণ কর্মীদের পূর্ণ অন্ধকারে রেখে। সাধারণ কর্মীদের অধিকাংশের জীবনের সঞ্চয় ভেস্তে যায়। কর্মচারীদের ৬২ শতাংশের 401K প্ল্যানও কোম্পানীর ভাগ্যের সাথে নিশ্চিহ্ন হয়। আরো জানা যায়, আর্থার এ্যান্ডারসন, এলএলপি এনরন থেকে কনসাল্টিং ফি বাবদ গেলো বছর ১০০ মিলিয়ন ডলার বাগিয়ে নেয়। কাগজ এবং হিসাবের কারচুপি করে এনরন গত ৫ বছরের ৪ বছরই কোন ট্যাক্স দেয়নি, বরং এ বছর প্রেসিডেন্ট বুশের ট্যাক্স কাট এর সুবাদে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার রিফান্ড প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দিন গুনছিল।

এনরনের বিপর্যয়কে একটি মহল একটি বিশেষ ব্যবসায়িক সংস্থারই ধ্বংস বলে বিবেচনা করছেন। বাণিজ্য মন্ত্রী ডন. ইভানস এবং ট্রেজারী সেক্রেটারী পল ও'নীল অমনটিই ভাবছেন। কোম্পানী আসে কোম্পানী যায়- এমত একটি মন্তব্য সম্প্রতি করেন পল ও'নীল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ঘটনার সাথে বর্তমান রিপাবলিকান প্রশাসনের অনেকেই জড়িত আছেন বলে ধারনা করা হয়েছিল। হিউষ্টনের এই কোম্পানী টেক্সাসের রিপাবলিকান সিনেটর ফিল গ্র্যাম এবং কে. বেইলী হাচিনসনের নির্বাচন প্রচারণা কাজে যথাক্রমে ৯৭,৩৫০ এবং ৯৯,৫০০ ডলার দান করেন বলে জানা যায়। জানা যায়, সিনেট ব্যাংকিং কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফিল গ্র্যামের স্ত্রী উইন্ডী গ্র্যাম এনরন বোর্ড এবং অডিট কমিটির একজন সদস্য। বিল গ্র্যাম আগামী নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে জানা গেছে। এটর্নী জেনারেল জন এ্যাশক্রফ্ট সিনেট ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় এনরন থেকে ডোনেশন পান ৫৭,০০০ ডলার। সম্ভাব্য তদন্তের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে এ্যাশক্রফ্ট ইতোমধ্যে এর কারণে অব্যাহতি নিয়েছেন।

এনরন প্রধান কেনেথ লে-এর শেষ মুহূর্তের যোগাযোগ ও সাবধানতার বাণী সত্বেও বুশ প্রশাসনের নির্বিকার চিত্ততাকে ডেমোক্র্যাটিক দল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে সক্ষম হবে না যে কারণে সেটি হল ঃ- গ্রাম বাংলার সেই খনার বচন 'তুমভী কাঁঠাল খারা, হামড়ী কাঠাল খায়া।' সেন্টার ফর রেসপন্সিবল পলিটিক্সের কার্যকারী পরিচালক ল্যারী নোবল সম্প্রতি জানান দু'দলের সর্বমোট ৭১ জন সিনেটর এবং ১৮৮ জন কংগ্রেসম্যান এনরনের ডোনেশন উপভোগ করেছে। রিপাবলিকান দল পেয়েছে ৮০০,০০০ ডলার এবং ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছে ৭০০,০০০ ডলারের মতো। যদিও কর্পোরেট, তেল ও এনার্জী স্বার্থ নির্ভর রিপাবলিকান দলের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী এনার্জী পলিসি নির্ধারনের জন্য এনরন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশ কয়েকবার গোপন সভায় মিলিত হয়েছেন বলে শুনা যায়, তথাপি এনরনের রাজনৈতিক ডোনেশন মোটামুটি দল-নিরপেক্ষ বলা যায়। প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন এবং তার প্রথম বাণিজ্য মন্ত্রী রন ব্রাউন এনরনের সান্নিধ্যের মানুষ ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

এনরন এবং উভয় দলের গভীর সন্নিবিষ্টতার কথা বিবেচনা করেই সম্ভবত সিনেটর জন কর্জাইন বলেন, For a country that believes in checks and balances, we have left too much to the decision of the marketplace. তিনি বলেন, কংগ্রেসম্যানরা নিজেদের স্বার্থেই বর্তমানের Deregulation অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবেন না Re-regulationএর দ্বারস্থ হবেন। তবে আমূল বা বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন আশা করা ঠিক হবে না বলে তিনি মত দেন। এদেশের শাসক বিত্তবান, প্রভাবশীল শ্রেণী যে একটি কায়েমী স্বার্থে একাত্মা - তা স্পষ্ট হয়ে গোল্ডম্যান এন্ড স্যাকস এর প্রাক্তন কো-চেয়ারম্যান এবং সিইও, বর্তমান ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর জন কর্জাইনের উল্লেখিত মন্তব্যে। স্মর্তব্য, কর্জাইন সিনেটর নির্বাচনে ৬৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন।

অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/সংকটের ব্যাপারে জর্জ উইল লেখেন এখন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শী এবং কর্মীবাহিনী পুঁজিবাদের যতটুকু ক্ষতি করতে পারেনি, তার চেয়ে বেশী পুঁজিবাদকে Delegitimize করেছে কিছু পথভ্রষ্ট পুঁজিবাদী। আমেরিকার ষ্টক মালিকানার 'পরিবর্তিত জনসংখ্যা' প্রেক্ষিতে তিনি আরো লেখেন- A nation in which a majority of households own equities is neurologically wired to the stock market. Hence corporate corruption quickly begets political demoralization and cynicism. এই প্রবণতা সময় থাকতেই বোধ করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত দেন। ০

নিউ জার্সী

জানুয়ারী ২২, ২০০২।

পরিচিন্তন

রাজনৈতিক চশমা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

আমরা যারা বিদেশে থাকি তাদের দেশের কথা ভেবে কী লাভ। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের নাক গলানোটা আদৌ অনধিকার চর্চা কি না; এরকম প্রশ্নও মনে এসেছে যে, দেশের সুধীজনরা দূরে বসে আমাদের দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করার সদিচ্ছাকে আবার ভুল বুঝবে না তো?

এত ভাবাভাবির পর যখন ওয়েস্টার্ন য়ুনিয়ন বা র‍্যান ক্যাপ লিমিটেড বাদ দিয়ে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠাই তখন মনের মধ্যে অকৃতজ্ঞতাবোধ কিছুটা হলেও কমে আসে। ভাবি খুবই পরোক্ষভাবে হলেও প্রবাসী হয়ে দেশ সেবা করার দুর্লভ সুযোগটাতো কাজে লাগাচ্ছি।

যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে বাংলাদেশীরা চাইনীজ বা ভারতীয়দের অনেক পরে এসেছে, তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ওদের চেয়ে বেশী সময় নিয়েছে এটা মনে করা ঠিক না। এখন অনেক বাংলাদেশী তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে উপরে উঠছে। সিলিকন ভ্যালীর হাইটেক কোম্পানীগুলোতে এখন হয়তো দু' বা তিনজন বাংলাদেশী ভাইস প্রেসিডেন্ট খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে তবে দশ বছর পর হয়তোবা দশ বার জন বাংলাদেশী আমেরিকানকে এরকম পদমর্যাদায় দেখতে পাওয়াটা অসম্ভব হবে না। একথা সত্য, দেশকে বঞ্চিত করে আসার জন্য কম বেশী অপরাধবোধ আমাদের সবারই আছে, আমরা সবাই সুযোগ খুঁজি কিভাবে দেশকে প্রতিদান দিয়ে পাপবোধটা একটু প্রশমিত করা যায়। বাংলাদেশের ভাল হবে যদি দেশের অভিভাবকরা প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশের জন্য লালন করা সদিচ্ছাগুলোকে দেশ গঠনে কাজে লাগাতে পারে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার একত্রিশ বছর হল। এ পর্যন্ত আমরা অনেক সরকার অনেক তন্ত্র দেখলাম । দিনের শেষে হিসেব করে সামগ্রিকভাবে আমরা সবাই খুবই হতাশ । একজন প্রবাসী হয়ে তাই এই বোধটুকু আমার জন্মেছে যে দেশের ভাল করার জন্য আমাদের প্রবাসীদের সবারই পারলে রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠা দরকার। দেশে ছাত্র শিক্ষক সরকারি কর্মচারি উকিল ব্যারিষ্টার কুলি মজুর কৃষক সবাই রাজনীতিতে সক্রিয়। বেশী বেশী রাজনৈতিক সক্রিয়তার ফলাফল আমরা দেখছি। আমরা জয়নাল হাজারীকে ভোট না দিয়ে ভি পি জয়নালকে অথবা হাজী সেলিমকে না দিয়ে পিন্টুকে ভোট দিচ্ছি। তাই দেশের সাধারণ মানুষের কিছু হল না, দেশের গণতন্ত্রটা এরকম ভাবে চলতে থাকলে ওদের কোন দিনই কিছু হবে না। পরাধীন যখন ছিলাম, দেশটা স্বাধীন হওয়ার জন্য সবশ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রয়োজন ছিল, অফিস আদালতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। তবে স্বাধীন দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সক্রিয়তা নয় রাজনৈতিক সচেতনতাই যথেষ্ঠ। দেশের সাধারণ জনতা মিথ্যুক রাজনীতিবিদদের কথায় বিশ্বাস করাতে তাদের ছেলেমেয়েরা হতাশা ছাড়া কিছু উপহার পায়নি অথচ অনেক নেতাদের ছেলেমেয়েরা এখন বাপের কালো টাকায় আমেরিকায় পড়াশোনা করে। বাপের কালো টাকায়তো অনেক আমলা ও ইঞ্জিনিয়ারের ছেলেমেয়েও বিদেশে পড়ছে, তাহলে আমার রাগটা শুধু রাজনীতিবিদদের উপর কেন? এই কারণে যে বড় বড় লেনদেনের ফাইলে শেষ সিগনেচারটি তারা মন্ত্রী মশাইরাই দেয়। বড় সাহেব ঘুষ না খেলে তার অধীনস্থ ছোটসাহেব সুবিধা করতে না পেয়ে বদলীর জন্য রাজনৈতিক কানেকশন থাকলে মন্ত্রী বড়জোড় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ধর্না দেবে। আর মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীও যদি সৎ হন তবে দুষ্ট কর্মচারির কষ্ট করে হলেও শিষ্ঠ না হয়ে উপায় নেই।

আমাদের দূর্ভাগ্য আমরা যারা বিদেশেও আছি তারাও চিন্তা ও চেতনায় দেশের মানুষের চেয়ে উপরে উঠতে পারি না। দেশের মানুষের অনেক সময় উপায় থাকে না; হাত পা এমন কি কণ্ঠটাও ভয়ে চালাতে হয় কিন্তু প্রবাসীরাও কেন বন্দীর মত আচরণ করছি ।

যেমন একদিন এক বাসায় দাওয়াতে গেলাম। চেনাজানা এক ছেলে কাছে এসে জানতে চাইলো, ভাই দেশ কেমন চলছে?

আমি বললাম, তুমি কেমন চলছে শুনলে খুশী হও অর্থাৎ কোন ভার্সনটা জানতে চাও ।

ও অনেকটা থতমত খেয়ে বললো, জনি গেল সপ্তাহে দেশ থেকে ফিরলো, ও তো বললো খালেদার ১০০দিনে দেশের আইন শৃংখলার অনেক উন্নতি হয়েছে । ওর খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বললো, জানেন জনি না বুয়েটে থাকতে জাসদ করতো।

আমি ওর প্রশান্তিটা দীর্ঘস্থায়ী হতে না দিয়ে বললাম, আরে তোমাদের সুপরিচিত টনিও এসেছে গতকাল দেশ থেকে; ওর কাছে শুনলাম আইন শৃংখলা কেন দেশে এখন মানবধিকারেরও বারটা বেজেছে । সরকার আইন শৃংখলার উন্নতির কথা বাদ দিয়ে প্রশাসনকে বিএনপি বা জামাতকরণ ও রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেয়াতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওর মনটা খারাপ হয়েছে বুঝতে পেরে বললাম, রাখ তোমার জনি আর টনির পর্যবেক্ষণ, শোন এই সরকার পলিথিনকে যে নিষিদ্ধ করেছে এটা খুবই একটা প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। শ্রোতা ছেলেটা উৎফুল্ল হয়ে আরও একটা উপাত্ত যোগ করে, কেন বিশ বছরের পুরনো গাড়ী নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটা?

আমি বললাম, এটা কার্যকর করা কঠিন হবে তবে কার্যকর করতে পারলে এটা অবশ্যই ভাল পদক্ষেপ।

এবার সে আনন্দে গদগদ হয়ে বললো, সবইতো দেখছি ভাল, তা খারাপ কি দেখলেন এদের।

আমি বেরসিকের মত বললাম, খারাপের কথা বলছো, শোন তাহলে; বাংলাদেশের মত গরীব দেশে ষাটজন মন্ত্রীর কোন দরকার নেই। সাইফুর রহমান সাহেব বলেছেন, সরকারি কর্মচারির সংখ্যায় অন্তত: শতকরা ত্রিশ ভাগ চর্বি। তার হিসেবে মানুষ গুরুত্ব দিতো যদি সে সাহস করে বলতে পারতো যে তাদের মন্ত্রী সভার সাইজটার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই অপ্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের মত গরীব দেশে মন্ত্রী সভার পরিবর্ধন মানে আরও ডজনখানেক বেশী লোককে চৌর্যবৃত্তির সরকারি লাইসেন্স দেয়া, এ কথা মান?

ছেলেটা মাথা চুলকাতে চুলকাতে প্রসংগ বদলায়, দেখেন হাসিনার কান্ড, টনি ব্লেয়ারকে বলে এই সরকারে নাকি তালেবান আছে। বিদেশের কাছে

দেশের ভাবমূর্তি কেউ এভাবে নষ্ট করে! মুখ পাতলা মহিলা কোথাকার; এখন যদি সোমালিয়ার মত বাংলাদেশেও আল কাইদার টেরোরিস্ট সেল আছে বলে ন্যাটো জোট বাংলাদেশের উপর ক্ষেপে ওঠে।

আমি বললাম, অবশ্যই বিদেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা শেখ হাসিনার উচিত হয় নি। বিবিসি-র কাছে সাক্ষাতকারে এটার ব্যাখ্যা হিসেবে হাসিনা বলেছে, গোপালগঞ্জের এক সভায় ইসলামি ঐক্যজোটের একজন শ্লোগান তুলেছিল, আমরা সবাই তালেবান বাংলা হবে আফগান। ইসলামি ঐক্যজোট চার দলের শরিক দল, তাই তাদের অন্তর্ভুক্তি পরোক্ষভাবে বলে চারদল তালেবান কনসেপ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি বললাম, হাসিনার ব্যাখ্যাটা দূর্বল এবং বক্তব্যদানে অবশ্যই তার দেশের কথা ভাবা উচিত আগে পার্টির কথা না ভেবে।

ও তৃপ্তির সাথে বললো, খালেদা কিন্তু সে হিসেবে বেশ সাবধানী। ভেবে চিন্তে কথা বলে, কি বলেন?

আমি ওকে হোম রান করতে দিলাম না, বললাম, খালেদা তো কথাই বলে না। একবার সংসদে চুপ বেয়াদপ বলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সে পার্টীর নেতাদের মোসাহেবী বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াতে শুধু মুচকি মুচকি হাসেন। দেখে এতেই কাজ হচ্ছে ভাল। বোবা হওয়ার পর থেকে শত্রুও কমে গ্যাছে ।

ছেলেটা প্রতিক্রিয়া দেখায়, কেন মন্ত্রী সভায় উনি নিজের বক্তব্যতো নিজেই দেন।

আমি শুধরিয়ে দিলাম, নিজের নয় অন্যের লেখা। তা ক্রিকেটের মত রানারের ব্যবস্থা থাকলে সেটাও ছেড়ে দিতেন শুধু সুন্দর একটা চেয়ারে সুন্দর একটা মহিলা অলংকার হিসেবে বসে থাকতেন।

ছেলেটা হালকা ক্ষেপে গ্যালেও সম্মান বজায় রেখেই বলে, যাই বলেন বিএনপি কখনই আওয়ামী লীগের মত বিদেশের কাছে দেশকে ডোবাবে না।

আমি বললাম, দেশকে কে ডোবাবে কে ভাসাবে এর প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ বর্তমান রাজনীতিবিদরা আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জের ফাইনানসিয়াল এনালিস্টদের মত। ওদেরকে বিশ্বাস করে সাধারণ মানুষ পথে বসে কিন্তু ওদের সবসময় লাভই হয়। হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া পার্টি ক্ষমতায় গ্যালে সবাই তো নীতিভ্রষ্ট হয়। হাসিনা টনি ব্লেয়ারকে যা বলেছে সেটা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে অনেক দেশী ও প্রবাসী বাঙালী। ডেইলী স্টারের চিঠিপত্রে হাসিনার গুষ্ঠি উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছুদিন জুড়ে; খুবই কাংখিত জাগরণ। কিন্তু আমরা গেল বছরের প্রথমদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে 'সবচেয়ে জালিয়াত জাতি'-র যে লাঞ্ছনা এসেছিল সেটা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল সেটা কিন্তু হিসেব করে দেখিনি। নীতিগতভাবে আমাদের সততা নীচে নেমে গেলেও পৃথিবীর মধ্যে এই বিষয়ে গোল্ড মেডেল প্রাপ্তিটা অগ্রহণযোগ্য।

ছেলেটা বলে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালতো একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠান। ওরা একটা মিথ্যে তথ্য দেবে কেন?

আমি আমার পর্যবেক্ষণটার সাহায্য নিয়ে বললাম, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি সংগঠন বাংলাদেশের মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে যে নম্বর দেয় তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারিত হলে পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার থেকে অনেক ভাল হত। বাকি দুটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে নেগেটিভ নম্বর দেয়। ৩ টি নম্বর যোগ করে ৩ দিয়ে ভাগ করলে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নিম্নে চলে যায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তার ওয়েব সাইটে প্রকাশিত অবস্থান তালিকার নীচে ডিসক্লেইমার জুড়ে দিয়ে লেখে, বাংলাদেশের অবস্থান ৩ টি মাত্র উপাত্ত হতে সংগৃহীত হওয়ায় সঠিক নাও হতে পারে। দুঃখজনক হলেও সত্য; আওয়ামী বিরোধী বাংলাদেশী কোন প্রতিষ্ঠান ভোটের আগে মনে হয় রাজনৈতিকভাবে পার্টিকে হেয় করার জন্য মনগড়া নেগেটিভ উপাত্ত সরবরাহ করে আওয়ামীলীগকে হেয় করতে যেয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে পুরো জাতিকে ছোট করেছে। বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশীদের লজ্জিত অবস্থানকে সে দিনের বিরোধীদল বিএনপি বিদেশী মেহমান জিমি কার্টার সহ দেশী বিদেশী সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, খালেদা তখন মুচকি মুচকি আর সাইফুর তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন।

ছেলেটা হতাশাগ্রস্থ হয়ে বলে, আপনার বক্তব্যটা কি ঠিক করে বলবেন একটু ।

এত কিছু বলার পরও ঠিক করে বলতে হবে ? শুনে ছেলেটা আমার দিকে মানি না মানব না গোছের খরচোখে তাকিয়ে থাকলো ।

আমি খুব ভাল করে খেয়াল করে দেখলাম ছেলেটা রাজনৈতিক চশমা পড়ে আছে ।

খাওয়া দওয়া শেষে বাসায় এসে বাথরুমে ঢুকে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করতে গেলাম; আয়নায় নিজের সাথে চোখাচোখি হল; আশ্চর্য্যের সাথে দেখলাম আমিও রাজনৈতিক চশমা পড়ে আছি, শুধু চশমাটার বয়স হয়েছে বিধায় ওটার পাওয়ারটা কমে গ্যাছে অনেক। o

সান ফ্রান্সিসকো বে-এরিয়া
জানুয়ারী ২২, ২০০২।

রাগ, অনুরাগ

'টু সেট দ্য রেকর্ড স্ট্রেইট ...'

আলম খোরশেদ

'রাগ, অনুরাগ' এর বর্তমান কিস্তির শিরোনামায় বিজাতীয় ভাষা ব্যবহার করতে হলো, কেননা এর যুতসই কোন বাংলা বাক্যবন্ধ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তাছাড়া আজকের লেখার বিষয় ভাবনার অন্তর্নিহিত প্রতীতীটুকু প্রকাশের জন্য মনে হয় এর চেয়ে উত্তম বিকল্পও আর কিছু নেই। ইতিহাসবিস্মৃত জাতি বলে এমনিতেই একটা বদনাম রয়েছে আমাদের, তার ওপর সম্প্রতি লক্ষ্য করছি ইতিহাস বিকৃতিরও একটা সচেতন উদ্যোগ আমাদের সমাজ শরীরে সচল হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি তথা আন্তর্জাল এর সঙ্গে সম্পর্কিত সকলেই জানেন যে অভিবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে

প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু আন্তর্জাল আলোচনা ফোরাম, যেমন ‘‘ই-সমাবেশ’’, ‘‘আলোচনা’’ ‘‘আলাপ’’, ‘‘সেতু বন্ধন’’, ‘‘বিদেশ’’, ‘‘মুক্তমনা’’, ‘‘মুক্তচিন্তা’’ ইত্যাদিতে বাংলা, বাঙালী ও বাংলাদেশ বিষয়ক নানাবিধ ভাবনা ও ইস্যুতে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে অহর্নিশি। বর্তমান লেখক সে সবের একজন মনোযোগী পাঠক, যদিও সেই সব অন্তহীন ও প্রায়শই অন্তঃসারশূন্য বিতর্কে প্রবেশে তার উৎসাহ সামান্যই। তো সেই সব ফোরামে আলোচিত কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাতের ইচ্ছে নিয়েই বর্তমান লেখাটির সূচনা। ইচ্ছে রইলো আগামীতেও এমনি আরও কিছু সমসাময়িক ইস্যুতে আন্তর্জালের চায়ের কাপে যে ঝড় বয়ে চলেছে তার কিছুটা আভাস পড়শীর পাঠকদের সামনে তুলে ধরার এবং সেই সুবাদে এই লেখকের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিটুকুও ব্যাখ্যা করার।

এই সিরিজের প্রথম প্রসঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়, স্বাধীনতা বিরোধী তথা রাজাকারদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিষয়টি। সম্প্রতি এই নিয়ে উপর্যুক্ত ফোরামগুলোতে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে, যা পড়ে এই লেখকের মনে হয়েছে যে, সম্পূর্ণ সত্যটা যেন কেউই ছুঁতে পারেন নি। এক দলকে মনে হয়েছে অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতাবশত সত্যের অপলাপ ঘটাতে, আর এক পক্ষের লেখা পড়ে মনে হয় তারা জেনে শুনেই জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সচেতনভাবে ইতিহাসবিকৃতি ঘটাচেছন, কোন এক বিশেষ দূরভিসন্ধি নিয়ে। বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে বিশেষ করে স্বাধীনতাউত্তর প্রজন্মের মধ্যে একটি কথা বেশ চালু হয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে ‘বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা’। বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় বর্তমানে স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উঠলেই তারা বেশ নিশ্চিত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে এর জন্য তো স্বয়ং মুজিবই দায়ী, কেননা তিনিই তো ঢালাওভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তাদের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে যারা বিশদ খোঁজ খবর রাখেন, তারা জানেন কত বড় সত্যের অপলাপ তা। কেননা বঙ্গবন্ধু কখনোই ঢালাওভাবে সকল স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের ক্ষমা করেন নি। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সব বিপথগামী ব্যক্তিদেরই ক্ষমা করেছিলেন যারা কেউবা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য কেউবা প্রলোভনের শিকার আর কেউবা স্রেফ অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে রাজাকার কিংবা শান্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু সচেতন ও সক্রিয়ভাবে, প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গে কোন প্রকার হত্যা কিংবা ধ্বংসযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেনি, কিংবা করে থাকলেও যাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করা যায় নি। কিন্তু তিনি কষ্মিনকালেও চিহ্নিত ও নেতৃস্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের, যাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, হত্যা, ধর্ষণ, দেশদ্রোহীতা ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, কাউকে ক্ষমা করেন নি, বরং বিশেষ দালাল আইনে তাদের আটক করে জেলবন্দী করেছিলেন। এদের মধ্যে বর্তমান বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পিতা কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরী কারাগারে বন্দী অবস্থাতেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন। এছাড়া বাকী সব দালাল শিরোমণি, যেমন সবুর খান, খাজা খয়ের, মাওলানা ফরিদ আহমদ, মাওলানা মান্নান, আবদুল আলিম, নিজামী, মুজাহিদ প্রমুখ সকলকেই পাকড়াও করে জেলে ভরা হয়েছিল এবং বিশেষ দালাল আইনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তথা আওয়ামী লীগ কর্তৃক এদেরকে ক্ষমা ঘোষণার প্রশ্নটাই তাই অবান্তর। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সরাসরি বিরোধীতাকারী দল হিসেবে এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী দল হিসেবে জামাতে ইসলামীর রাজনীতিকেও বাংলাদেশের মাটিতে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন মুজিব। আজ তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে সেই সব অভিযুক্ত ও বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীরা এমন সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলেন কিভাবে? কীভাবেই বা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে শরিয়তী ও আসমানী আইনে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শে বিশ্বাসী দল জামাতে ইসলামী এমন বহাল তবিয়তে ধর্মের নামে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সর্বাগ্রে বাংলাদেশের বর্তমান শাসক দল বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের দ্বারস্থ হতে হবে কেননা তার প্রত্যক্ষ মদদে ও নিজস্ব উদ্যোগেই সূচিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার পুনর্বাসন পালা। নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও পঁচাত্তরের ষড়যন্ত্রময় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগে অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তিনি প্রথমেই যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে একাত্তরের অন্যতম প্রধান দালাল শাহ আজিজুর রহমান (যিনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বয়ং জাতিসংঘে গিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেন) কে তার উজিরে আজম নিয়োগ করা। এরপর জেনারেল জিয়া একে একে দালাল আইন বাতিল করে কারাবন্দী রাজাকার প্রবরদের সকলকে বেকসুর মুক্তি দেন। সংবিধান সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতাকে অপসারণ করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামীকে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পুনরায় রাজনীতি করার অবাধ সুযোগ করে দেন এবং তাদের নাটের গুরু একাত্তরের গণহত্যার প্রধান নীল নক্সাকারী পলাতক গোলাম আজমকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনেন সসম্মানে, যাকে পরবর্তীকালে তার বিধবা পত্নী বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেন।

এরপরের ইতিহাস সকলের জানা। জিয়ার এই উপঢৌকনের দৌলতে সুচতুর জামাত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সূচ হয়ে ঢুকে আজ ফাল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে চার দলীয় জোটের ব্যানারে। আর তার সুযোগ্য সহধর্মিনী স্বামীর ট্র্যাডিশন সমানে অব্যাহত রেখে একাত্তরের দুই নরঘাতককে তার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে তাকে মহিমামণ্ডিত করেছেন। অবশ্য একথা সত্য, জামাতের আজকের এই প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের পেছনে আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতির অনেক দ্বিধা, দুর্বলতা, আপোষকামীতা ও শ্রেণীচরিত্রের ভূমিকাও একেবারে কম নয়, কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ সংগঠন থেকে সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিতাড়ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অপসারণে এবং স্বাধীনতার বিরোধীতাকারীদের পুনর্বাসনে জেনারেল জিয়া তথা বিএনপি'র উপর্যুক্ত পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডসমূহকে দ্বিধাহীনভাবে চিহ্নিত না করা হলে, আমরা কেবল একটি আত্মবিস্মৃত জাতি হিসেবেই নয়, আত্মপ্রতারিত জাতি হিসেবেও পরিচিত হবো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। সেই আত্মপ্রতারণা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই বিধৃত হলো আমাদের প্রকৃত ইতিহাসের এই বিস্মৃত ও ব্যথিত বয়ান।

o

মন্ট্রিয়ল, কানাডা

জানুয়ারী ১৮, ২০০২।